দ্যূতক্রীড়ক সম্পর্কে...

অনুরাধা কুন্ডা

এ এক পুরনো কলকাতা। এখানে রাস্তায় মুড়ি-মুড়কির দোকান। সেখানে মুড়ি, মুড়কি, খই, চিঁড়ে, গুড়, বাতাসা, ছাতু বিক্রি হয়। শীতকালে মুড়ির চাক, চিঁড়ের চাক। কুচো গজা বা তিলকূটও ভাজা হয়। বামুনের বউ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মালপো ভাজে।

এই প্রথম কলকাতার ফুটপাথ সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হয়েছে। আর এই রাস্তাতেই ঘোড়ার গাড়ি করে যান এক উজ্জ্বল যুবক। তাঁর নাম সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

এইভাবে ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিক ছবি আঁকেন কলমে। অডিও এবং ভিস্যুয়াল, দুইই অসম্ভব তীক্ষ্ণ ও মেধাবী। কাহিনিতে মগ্ন হতে হয় প্রথম থেকেই। যেন একের পর এক ছবি আঁকা হচ্ছে। এই কলকাতায় তখনও প্রচুর খোলা মাঠ, সদর দরজার পাশে বসার জন্য রোয়াক, মহেশ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত মন্দির এবং তাঁর গোয়াল। সুকিয়া রোড জীবন্ত হয়ে ওঠে বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খতায়, জীবন্ত হয়ে ওঠে সুনীতির বাড়ি, খসখস, উল্টো দিকে উত্তম মুদির দোকান। এইসময়ে কলকাতায় এক পয়সার সমানুপাতিক ছিল আশিটি কড়ি।

এরপরেই অঘোরনাথ ঘোষের আগমন এবং তাঁর মুখে দুঃসংবাদ — শিশিরের বউ আত্মহত্যা করার জন্য গায়ে আগুন দিয়েছে। খুব খারাপ অবস্থা।

মৃদুমন্দ, বেশ দুলকি চালে চলতে থাকা কাহিনিটি এবার ঝাঁকুনি খেয়ে একটা নতুন মোড় নিল, যাকে বলে নাটকীয়। এবং মঞ্চে এলেন কাহিনির নায়ক, শিশিরকুমার ভাদুড়ি।

শিশিরকে ঔপন্যাসিক দেখালেন সুনীতির চোখ দিয়ে। সুনীতি আঠেরো আর শিশির উনিশ।

ইতিহাসকে কাহিনীর গতির সঙ্গে এমনভাবে মেশানো হয়েছে, যেমন মিষ্টান্নে গুড়। শিশির সবার থেকে আলাদা। সুনীতির নাট্যচর্চার অজানা ইতিহাস উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে গেল আর এক কিংবদন্তি পুরুষের জীবন। তাঁর অনন্য আবৃত্তিশৈলী থেকে তাঁর রূপ।

''আর শিশিরের ওই রূপবান, স্পর্ধিত হাঁটার প্রতিটি শরীরভঙ্গিমা বলে দিচ্ছে, শিল্পের বেদীতে আত্মপ্রকাশ করার জন্যই তার আবির্ভাব, অভিনয়ের আগুনে এই সোনালী পতঙ্গরা বারবার ঝাঁপ দেবেই।'' শিশিরকে ধরা হল যেন ক্যামেরার লেন্সে। কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত হওয়ার সময়ে।

ইতিহাস এবং ইতিহাসচেতনাকে মিলিয়ে প্রবাদপুরুষের জীবন কথিত করা এক অতীব দুরূহ বিষয়। ব্রাত্য বসুর অতীব সচেতন ইতিহাসচেতনা, মেধাবী ইতিহাসচর্চা, অভিজাত ভাষাপ্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানবমনের গভীর বিশ্লেষণ। একটি সহৃদয় অথচ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। সুনীতির শেরিডান পাঠ, মহেশ

ঘোষের নারকেলের মালায় মেপে দুধ বিক্রির খুঁটিনাটি, গরু মোষের গব্য রাজভোগ যাতে আছে ছোলার গুঁড়ো, পালং, বিচালি, কাপাসবিচির খোল, নারকেল কোরা ইত্যাদি, এক পুরনো খানদানী কলকাতার আমেজ নিয়ে আসে। ফলে উপন্যাসটি আগাগোড়া সুখপাঠ্য।

ফ্ল্যাশব্যাকে চলে কাহিনি। সুকিয়া রোড থেকে যুগীপাড়া লেনের দিকে ছুটে চলা ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে সুনীতির মন ও মননে ধরা পড়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ি। হেদুয়ার জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ কলেজ, নতুন নামে স্কটিশ চার্চ, স্কটল্যান্ড থেকে আগত প্রিন্সিপাল, মাইকেল হেমচন্দ্রের কবিতা, ব্যাণ্ডম্যান অপেরা কোম্পানি, চিটিংবাজদের জগৎ...সবে মিলে এক জমজমাট সময় আর থিয়েটারের স্বর্ণযুগ। সুনীতি আর শিশিরের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা দ্বিজুবাবুর দেখাশোনাটি শিশিরের মেধা আর ব্যক্তিত্বকে যখন চিনিয়ে দিচ্ছে, পাঠক বুঝবেন যে এ হতে যাচ্ছে এক প্রখর উপন্যাস। তেমনি ব্যাকগ্রাউণ্ড আবহাওয়া...রেওয়াজ করছেন দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র দানীবাবু। সেইসময় দ্বিজেন্দ্রলাল 'আনন্দ বিদায়' নাটক লিখছেন যেখানে আক্রমণ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জুতো খুলে মারছেন মঞ্চে। শিশিরের বিশ্লেষণ 'চাণক্য'-কে নতুন করে চেনাচ্ছে আর দ্বিজেন্দ্রলাল স্বীকৃতি দিচ্ছেন তরুণ এক উদীয়মান সূর্যকে। এ এক আশ্চর্য মুহূর্ত ব্রাত্যর লেখনীতে। এবং এমন আরও অনেক।

শিশিরের বিবাহিত জীবনটি এক অনির্বচনীয় মাধুর্যের সঙ্গে লিখেছেন কথাকার। কিন্তু তারও আগে আছে নটসূর্যের পিতার কথা। হরিদাস ভাদুড়ি। বাবা ছেলের সম্পর্ক। মা কমলেকামিনী। শিশিরের দাদু কৃষ্ণকিশোর। ফিলিপস সাহেবের সঙ্গে মহাভারত অনুবাদের কাজে মগ্ন কৃষ্ণকিশোর। পারিবারিক প্রেক্ষাপটটি জানা না থাকলে একজন মানুষকে প্রকৃত নিরূপণ করা যায় না। ব্রাত্য এক অতিশয় পরিশ্রমসাধ্য কাজ করেছেন। কৃষ্ণকিশোরের আয়ুর্বেদ চিকিৎসা, নিম, পুদিনা, বাসক, তুলসী যেমন নিপুণভাবে বর্ণিত, তেমনি শুভঙ্করীর আখ্যান। বালকমনের ভাণ্ডার। বলেছেন কথাকার। ড্রাই ল্যাট্রিন বা খাটা পায়খানার বৃত্তান্ত থেকে শুরু করে কৃষ্ণকিশোরের বালক শিশিরকে আবৃত্তি শেখানো বা হরিদাসের হান্টার দিয়ে সাহেব বসকে প্রহার....সবই চলচ্চিত্রের মত ভেসে যাবে পাঠকের চোখের ওপর দিয়ে। কৃষ্ণকিশোরের জন্য গলা কাঁপিয়ে সাবেকী আবৃত্তির ঢং পাল্টে নিয়েছিলেন শিশির। ব্যাকগ্রাউণ্ড স্টাডির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শেকসপিয়ার, মিলটন আবৃত্তি করা মাতামহ আর বিস্মিত বালক, ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার বিস্তারে কাহিনি সমৃদ্ধ।

মায়ের থেকে প্রাণশক্তি ও দায়িত্ববোধ, দাদামশাইয়ের থেকে সাহিত্যপ্রীতি, প্রবাসী পিতার থেকে নিস্পৃহতা, সিনিসিজম আর ক্রোধ। এই সব মিলিয়ে তৈরি হচ্ছেন শিশির ভাদুড়ি। প্রকৃতই মনঃপ্রকৃতির রহস্য উদঘাটন।

শিশির ও উষার বিবাহিত জীবনটিও ওই এক দক্ষতায় নির্মাণ। উদাসীন, নাটকপাগল শিশির আর অভিমানিনী, প্যাশনেট উষা।

শিশিরের বাড়ির একটি পরিষ্কার ছবি, চৌবাচ্চা, পিতলের বালতি সহ। নিখুঁত ডিটেইলিং। ফিল্মের মত। শিশিরের পুড়ে যাওয়া হাত আর সেই শান্ত কথা : ''মেয়েদের সম্বন্ধে কখনো উদাসীন হোস নে সুনীতি।''

শিশির ও উষার বিবাহিত জীবন, উষার আত্মহত্যা, এমনকি শিশিরদের খাটটির বিবরণ আশ্চর্য সংবেদনশীলতায় মোড়া। এর মধ্যেই সমকালীন ইতিহাস উঠে আসে। রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয়, কেদারের ভূমিকায় শিশির, গিরিশ ঘোষের 'অশোক' নাটকে শিশিরের কাল্পনিক লেলিহান শিখায় মরণ আর্তনাদ এবং তরুণী উষার ওপর তার প্রভাব....মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের একটি নিপুণ পর্যায়।

এরপর শিশিরের কলেজে পড়ানো, থিয়েটার ও মদ্যপান।

এর মধ্যেই গড়ে উঠছেন এক যুগপুরুষ। তিনি ছাড়তে চাইলেও কারুবাসনা তাঁকে ছাড়ে না। অলৌকিক সঙ্কেত পাঠায়। সুনীতির চোখ দিয়ে শিশিরের এই নির্মাণ উপন্যাসটিকে যেন বৌদ্ধিক মাত্রায় শ্রেষ্ঠ করে তোলে...

''প্রথম রোম্যান্স ও দাম্পত্যের ভেতর তৈরি হওয়া সেইসব ছোট ছোট ফাঁক, ছোট ছোট ভুল বোঝা এমনকি ছোট ছোট প্রতারণার কথাও? যে প্রতারণা অন্য কোন নারীকেন্দ্রিক বা তৃতীয়সম্পর্কভিত্তিক হয়ত নয়, শুধু দুটো মানুষের মধ্যে তৈরি হওয়া সাঁকোভাঙা এক দূরত্ব আর তার জন্য জলের মতো ঘুরে ঘুরে নিজেই গুমরে কাঁদা।" উষা ও শিশিরের শেষ কথোপকথন অতি পরিমিত অথচ গভীর সংলাপে সমৃদ্ধ। ''শিশির জানে যে সে আজ অভিশপ্ত। কারুবাসনা তার সর্বাঙ্গে অভিশাপ লেপে দিয়েছে।"

এরপরেই পাঠক পাবেন অধ্যাপক শিশিরকে। এবং কথাপ্রসঙ্গেই চলে আসেন প্রিন্সিপাল সারদারঞ্জন চৌধুরি, তাঁর ক্রিকেটপ্রীতি, ক্রোধী থেকে শান্ত, স্নিগ্ধ মানুষে পরিণত হওয়া মানুষটি এবং স্বাভাবিকভাবেই রায়চৌধুরি পরিবার। ব্রাত্য বসু এই সমস্তই বর্ণনা করে গেছেন গল্পচ্ছলে, কোনও ঝাঁকুনি নেই । স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বা প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মতো ব্যক্তিত্বরাও এসেছেন গল্পের সূত্রে, এসেছেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। উপন্যাসে সময় যেন বয়ে যাচ্ছে নদীর ধারার মতো। উঠে এসেছে বহুমূল্যবান তথ্য, যেমন সেইসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ছাপা হত ইংল্যাণ্ডে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তি, কবি দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক...দীনেশচন্দ্রের চরিত্রটিও স্বল্প পরিসরে পরিষ্কার, ''ক্ষমতার সামনে ঐ হাসি হাসতে হয়।"

রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র পুত্র অরুণ সেন, স্যর আশুতোষ, দেবদত্ত ভাণ্ডারকরকে নিয়ে যে অধ্যায়টি রচিত তা যেমন ইতিহাসসমৃদ্ধ তেমনই অধ্যাপনা জগতের রাজনীতির প্রতি তীব্রভাবে শ্লেষাত্মক। দান প্রতিদানের খেলাটি উপভোগ্য এবং এখান থেকেই নির্মাণ হচ্ছে শিশিরের চেতনা। ''জীবনের এই ভয় এবং তা কী করে ব্যক্তিনিরাপত্তাহীনতায় পরিণত হয়, শিশির তাকে আজকাল বুঝতে পারে। সে চাকরি ছাড়তে পারে না শুধুমাত্র এই কারণে। ছাড়লে থিয়েটারের জগতে কাদের হাতে গিয়ে সে পড়বে? আরো কোন ধূর্ত এবং বেদনাদায়ক মতলব, ঐ জলদেশের তলায় চলে বেড়ানো লোকগুলির মনে আছে সে নিজেও জানে না।"

কী অমোঘ পর্যবেক্ষণ। ''আত্মমর্যাদা যে এদেশে দ্রৌপদীর বস্ত্রের মতই ভঙ্গুর ও পতনোদ্যত, তা এখন হাড়ে হাড়ে জানে শিশির।" যুগোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে উপন্যাস।

শিশির থেকে এস.কে.বি শুধু শিশির ভাদুড়ির জীবন নয়,সময়ের দর্পণ। খুঁটিয়ে লেখা, অথচ বিন্দুমাত্র ক্লান্তি আসে না পঠনে। তর্কচঞ্চুর কুৎসিত হাসি, ক্লাসে তরুণ ছাত্রের লেখা ''দাদার কীর্তি", সেই সপ্রতিভ ছাত্রের ডিটেকটিভ নভেল লেখার সদিচ্ছা...রীতিমত শিহরণ জাগায়। তখন যে চার পয়সায় এক সের ময়দা পাওয়া যেত আর মিষ্টির দোকানে ফাউ দিত রসমুণ্ডি, তাও উল্লিখিত।

প্রেক্ষাপট নির্মাণ বড় কঠিন কাজ। ব্রাত্য বসু সেই কাজটি অসম্ভব দক্ষতায় তৈরি করে গেছেন সারা উপন্যাস জুড়ে। শিশিরের মেটারলিঙ্ক অধ্যয়ন, সহকর্মীর খোঁচা, কমলেকামিনীর সঙ্গে ''জনা" দর্শন অথবা প্রথম অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফিকে দর্শন, পর্দার ওপর বিজ্ঞাপন, সব জমজমাট এক পরিবেশ। জীবন নামক নাটক যেন ফুলঝুরির মতো জ্বলছে। অর্ধেন্দুশেখর জামাতার প্রয়াণবশত অভিনয় করতে পারলেন না, মঞ্চে তাঁর বদলে এলেন গিরিশ ঘোষ। নাটকের ইতিহাস শুরু এর পরে। নরীসুন্দরী, তারাসুন্দরী, বসন্তকুমারী যেমন এলেন, তেমনি এল বায়োস্কোপ প্রসঙ্গ।

দ্বিজেন্দ্রলাল শিশিরের প্রথম দেখার মতোই রোমাঞ্চকর গিরিশ শিশিরের প্রথম দেখা! যে প্রবল এনার্জি, হর্ষ, শক্তি মানুষকে জানান দেয় যে সত্যি কিছু একটা করতে হবে, ঔপন্যাসিক তার খোঁজ দিয়ে দেন।

জামশিদজি ফ্রামজি ম্যাডানের থিয়েটারের ব্যবসা এবং মাড়োয়ারিদের কলকাতার ব্যবসাজগতের ওপর আধিপত্য এবং মদনসাহেবের বাঙালি দর্শকের জন্য থিয়েটার বানানো, প্রাচীন ঘরানার অভিনয়, মাইকেল গিরিশ দ্বিজেন্দ্রলালের অনুপস্থিতি, পোশাকের একঘেয়েমি, থিয়েটারের সেট, আলোকসজ্জা সবকিছু নিখুঁতভাবে বলে যাওয়া। টানটান। ''সব মিলিয়ে থিয়েটার এখন দারুব্রহ্মবৎ হয়ে আছে।'' এই ইতিহাস জানা দরকার। রুস্তমজি কেরবানু অধ্যায়ের সঙ্গেই আসে রুস্তমজির মুম্বাইয়া নাটকের ব্যর্থতা। এইসবই তো শিশিরের উত্থানের পূর্বকথা।

এরপরেই চাকরি ছেড়ে ম্যাডান কোম্পানিতে যোগ দিলেন শিশিরকুমার। আশুতোষ ও শিশিরের কথোপকথন আবার এক বিস্ময়, যেমন বিস্ময়কর ''আলমগীর'' নাটকের বিজ্ঞাপন। নামভূমিকায় শ্রী শিশিরকুমার ভাদুড়ি এম.এ। শিশিরের নাটক নিয়মিত দেখতে যান সৌরীন্দ্র হেমেন্দ্র মণিলাল। মণিলাল আর হেমেন কিশোরসাহিত্য লিখতে ভালবাসেন। সত্যিই রোমাঞ্চ ঘটে।

আলমগীর মঞ্চস্থ হওয়ার দিনেই গ্রেপ্তার হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

সৌরীনের মুখে আমরা পাই শিশিরের অভিনেতা জীবনের বিবরণ। ''ভীমের পার্টে শিশির ভাদুড়ি সবাইকে ছাড়িয়ে গেল।'' শিশির অভিনয় করতে করতে সত্যদ্রষ্টা দার্শনিকে রূপান্তরিত হতেন। বাঙালি এমন থিয়েটার দেখেনি। নটী বিনোদিনী তখন অবসর নিয়েছেন। আলমগীরের গর্জন যেন কঙ্কালের টঙ্কার। তৃতীয় ব্যক্তির সংলাপে উঠে আসে শিশিরের অভিনয়প্রতিভা। কথাপ্রসঙ্গেই আসে আরভিঙের নিচু স্বগতোক্তির জাদু। সংলাপের উচ্চকিত ভাব কমিয়ে ভাববাদী গড়ন। থিয়োরিকেও মনোগ্রাহী করে তুলেছেন ঔপন্যাসিক।

এর মধ্যে উল্লিখিত হয় পোশাকের পরিবর্তন। সাটিন কিংখাবের ধুতির পরিবর্তে বেনারসী ধুতি পাঞ্জাবি। উল্লিখিত গলা দেখানোর প্রয়াসে শিশিরের রঘুবীরের ভূমিকায় অভিনয়। একই নাটকে দুটি গলা ব্যবহার। প্রতিষ্ঠিত হল শিশিরকুমারের ডাকসাইটে গলা।

কোনও মানুষই অসাধারণ হয়ে জন্মায় না। কালক্রমে সে অসাধারণ হয়ে ওঠে। যেমন হয়ে উঠছিলেন লগনচাঁদা শিশিরকুমার ভাদুড়ি।

বিশাল বিশাল উত্থান পতনের ইতিহাস তৈরি হয়ে চলেছে। মারা যাচ্ছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। আবির্ভাব হচ্ছে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেজে উঠছে স্টার থিয়েটার।

অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে পাবলিক থিয়েটারে যোগদান যে নিন্দনীয়, শিশির তা জানতেন। ঔপন্যাসিক উদ্ধৃত করেছেন গিরিশচন্দ্রের প্রিয় কবিতা : ''লোকে কয় অভিনয় কভু নিন্দনীয় নয় / নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ।'' এরপর আছে ''সহকারী বারাঙ্গনা''। কিন্তু শিশির কোনও পেশাকে অপমান করতে পারেন না। গিরিশের মৃত্যুর পরে সুশীলাবালার বক্তৃতা, বঙ্গদর্শন, ভারতী, সবুজপত্র সমকালকে প্রকাশ করছে। 'আলমগীর' অভিনয় কেন্দ্র করে বিস্তৃত ঘটনাবলি চিনিয়ে দিচ্ছে এক যথার্থ মহাতারকার উত্থান। সে অভিনয় চিৎকৃত নয়। ''যেন একটা নিচু কণ্ঠ, ধীরে ধীরে ময়াল সাপের মতো দর্শকদের সবাইকে তার ভেতরে গিলে নিচ্ছে। বাংলা মঞ্চে, নতুন সময়ের নতুন উচ্চারণ যেন খোদাই করা হচ্ছে।'' ঔপন্যাসিক নিজে অভিনেতা এবং নাটককার বলেই এই অতি সূক্ষ্ম বিষয়গুলি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। সৌরীন্দ্রমোহন শিশিরকুমারের নাটক দেখেছেন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এবং বিশ্লেষণ করেছেন। এই উপন্যাসের একটি মহৎ গুণ একাধারে সত্যনিষ্ঠতা এবং কল্পনার মিশেল।

''আলমগীর'' নাটকের সংলাপের প্রয়োগ এবং শিশিরকুমারের সংলাপ উচ্চারণের দীর্ঘ বিবরণ পাঠককে নাট্যচর্চার এক অজানা দিগন্তের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

''সাবেকি বাংলা অভিনয়রীতির উচ্চকিত আবেগদ্রব সংসক্তি নেই, নিরাসক্তি আছে। গদগদ ঘনিষ্ঠতার উদগ্রতা নেই, সমগ্র পৃথিবীর থেকে একটা বিচ্ছিন্নতা আছে।" বাংলা থিয়েটার এইভাবে তার নতুন নটকে গ্রহণ করল।

শিশিরকুমারের অভিনয় জীবনের বাঁকগুলি নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনই তাতে আছে ধীশক্তি। অধ্যাপনা ছেড়ে মদনসাহেবের কোম্পানিতে যোগদানের পর শিশিরের আবার পরিবর্তন। যে ধরনের থিয়েটার শিশির করতে চান তা কোনও বানিয়া প্রতিষ্ঠানে হবে না। দৃশ্যপট আঁকাবার সময়েই শুরু হল শৈল্পিক মতভেদ। মানসিকভাবে বেরিয়ে গেলেন রুস্তমজীর থিয়েটার থেকে শিশির, শ্যামলীর কুটির আঁকা কেন্দ্র করে।

ঔপন্যাসিক বলছেন অনিশ্চয়তা, বিপন্নতা মানুষকে কুরে কুরে শেষ করে দিতে পারে। কিন্তু ওগুলোই আবার মানুষকে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে শেখায়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এইভাবে চরম পর্যায়ে যায় যেখানে শিশির বলেন যে পাঁকে ডুবে যাচ্ছেন সেখান থেকে পাঁকাল মাছের মতো ছিটকে বেরোতে হবে।

''অহংকার ও দেমাকহীন পুঁজি বরাবর অলভ্য"। এমন অ্যাফোরিজমে সমৃদ্ধ এই উপন্যাস।

প্রবোধচন্দ্র গুহকে বলা হয় বাংলার বিসমার্ক। স্টার থিয়েটারের মালিক তিনি।

সমসাময়িক ইতিহাসের খনি তুলে দিয়েছেন ব্রাত্য বসু। বটতলা সাহিত্যখ্যাত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় শিশিরকে নিয়ে এলেন স্টারে। 'কর্ণার্জুন' নাটক হিট হল।

অথচ শিশির বোধ করছেন এই নাটকে নতুন যুগের নাট্যভাষা নেই।

শিশিরের ক্রমবিকশিত বোধ ও চিন্তাধারার পাশাপাশি লেখা হয়েছে তৎকালীন নাটকের ব্যবসা ও বিপন্নতার কথা যা একজন প্রকৃত শিল্পীকে ব্যথিত করে।

বাঁধা মঞ্চে সরকারি অভিনয়ের প্রস্তাব এল শিশিরের কাছে।

এরই মধ্যে লিখিত হয়েছে তিনকড়ি-কন্যা প্রভা ও শিশিরের বৃত্তান্ত, প্রভার শিশিরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। প্রভা শিশিরের নতুন থিয়েটারে যোগ দিলেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য হয়ে উঠলেন মহর্ষি।

এত যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে চলেছে সেই সময়ে এবং তাদের সকলকে সুচারুভাবে একটি ক্যানভাসে আঁকা যে কতটা দুরূহ কাজ হতে পারে, তা এই উপন্যাস পাঠে বোঝা যায়।

সীতা নাটক এডিট করে অভিনয় করার সময়সীমা ছিল তিন সাড়ে তিনঘন্টা। রাম শিশিরকুমার। প্রভা সীতা। এবং সীতা হিট।

ওদিকে পাশা খেলার প্রতিটি ছক ও দান বর্ণিত নিপুণভাবে। অহীন্দ্র চৌধুরির আগমন। নতুন সীতার মঞ্চায়ন। গীতিনাট্য বসন্তলীলা, যাতে গান গাইতে এলেন এক তরুণ অন্ধ গায়ক। তাঁর নাম কৃষ্ণচন্দ্র দে।

এল মনমোহন থিয়েটার। প্রবোধচন্দ্রের পাল্টা চাল। নাটমন্দির নতুন সীতার দর্শক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

ক্রমশ শিশির এই দ্যূতক্রীড়ায় পোক্ত হয়ে উঠছেন। তিনি তখন বাংলা থিয়েটারের প্রথম প্রোডিসার ডিরেক্টর। তিনি নতুন সময়ে নতুন অভিনয়ের শারীরিক ভাষাও পরিবর্তন করছেন।

শিশিরের মুখেই ঔপন্যাসিক বসিয়েছেন বাংলা থিয়েটারে তাঁর অবদানের কথা।

শিশির প্রথম শেখালেন যে অভিনয় একটা টিম গেম। টিমটা হবে তেল খাওয়া মেশিনের মতো পেশাদার।

শিশির শেখালেন অভিনেতার স্বরক্ষেপণের সঙ্গে শরীরী ভঙ্গিমার তালমিল থাকতে হবে। নাচে, গানে, পোশাকে, রঙে চিন্তার সুনির্দিষ্ট ছাপ থাকবে। প্রতিটি অভিনেতা তার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নিজের মতো করে অনন্য হবে।

শিশির থিয়েটারি প্রকরণে বিপ্লব ঘটালেন।

সারি সারি ফুটলাইটের পরিবর্তে নিয়ে এলেন অজস্র ফ্লাডলাইট ও স্পটলাইট।

মঞ্চের পাশ থেকে সরিয়ে দিলেন উইংগস বা পার্শ্বপট। থিয়েটারে আনলেন থ্রি ডায়মেশনাল দৃশ্য। মঞ্চের মধ্যে তৈরি করলেন রাজপ্রাসাদ আর দরজা যার মধ্য দিয়ে অভিনেতারা অনায়াসে চলাচল করতে পারে। বাংলার দর্শককে শিশির প্রথম মঞ্চে খোলা আকাশ দেখালেন।

সীতা দেখতে এলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের শিশির প্রশংসা ঘিরে শুরু হল নতুন বিতণ্ডা। দ্যূতক্রীড়া চরমে। মনমোহন পাঁড়ের সামনে অসহায় শিশির।

কঙ্কাবতী সাহুর সঙ্গে শিশিরের পরিচয় ও বিবাহ শিশিরের জীবনে ও উপন্যাসে একটি বড় টার্নিং পয়েন্ট। প্রথম গ্র্যাজুয়েট অভিনেত্রী স্টারে। নীহারবালা, ইন্দুবালার কথা এসেছে স্বাভাবিকভাবে। এসেছে নিভাননীর সঙ্গে শিশিরের প্লেটোনিক সম্পর্কের কাহিনি। ''জাঁদরেল জগদম্বাগোছের অসভ্যতা'' জাতীয় শব্দ ব্যবহারে থিয়েটারের আভ্যন্তরীণ কুঁদুলেপনা স্পষ্ট। সেখানে কঙ্কা শিশিরের জীবনে এক পান্থশালা।

শিশিরের বিদেশযাত্রা এই উপন্যাসের আর এক বাঁক। এখানেই এল সতু সেন প্রসঙ্গ, বাংলা থিয়েটারে যাঁর ভূমিকা অপরিসীম। এলেন এরিক এলিয়ট। শিশিরের বিদেশে শো এবং আফজল খাঁদের বর্জন করে নতুনদের নিয়ে শো করার প্রয়াস। চারুশীলার চক্রান্ত। যেন ফিল্ম বা থিয়েটারের স্ক্রিপ্টের মতোই ঘটনাবহুল। শিশিরের আমেরিকা সফরের ওপর ইনজাংশন।

বিদেশে এলিজাবেথ মারবেরির সঙ্গে দেখা হওয়াও এক তাজ্জব কাণ্ড যেখানে শিশির বুঝলেন স্বপ্নরা প্রতারক। সতু ও শিশির পর্ব জমে উঠছে। পরিচয় হচ্ছে রণজিৎ নামক এক যুবকের সঙ্গে যে জিন ও বংশগতি নিয়ে গবেষণা করছে।

সীতা নাটকের ত্রুটিগুলি আইডা ক্যাম্পবেলের কলমে, এবং চুক্তিভঙ্গের ইতিহাস।

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রশংসিত হল ''সীতা''। এইসঙ্গেই বিস্তৃতভাবে আছে রবীন্দ্রনাথের বিদেশসফর, সতু ও গান্ধির চিঠি। কলকাতায় তখন মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু। চার্লস টেগার্টের গাড়ি লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছে বোমা।

> The primary channel of transmission of culture is the family : no man wholly escapes from the kind, or wholly surpasses the degree, of culture which he acquired from his early environment"
> Towards the Definition of Culture.1948.rpt.London.Faber,1962

এই বিখ্যাত এলিয়টিয় উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলাম। শিশিরের শিশিরকুমার ভাদুড়ি হয়ে ওঠার পিছনে যে পারিবারিক প্রেক্ষাপট আছে, ব্রাত্য বসু সেটি বুনেছেন একেবারে মসৃণ মসলিনের কাপড়ের মখমলিয়ানায়। তার ঠাসবুনোটে জরির কাজের মতো রয়েছে তৎকালীন ঘটনাসমূহ, নাট্যজগতের অন্দরে এবং বাহিরে।

শিশিরের মাতামহর কাছে ইংরিজি পাঠ, যার ফলে বঙ্কিমের কোন চরিত্রের মধ্যে শেক্সপিয়রের ওথেলো নাটকের একটি চরিত্রের ছায়া পড়েছে, এর উত্তর দিতে শিশিরকুমার সফল হয়েছিলেন...বুঝিয়ে দেয় শিশির ভাদুড়ি কীভাবে তৈরি হয়েছিলেন বা করেছিলেন নিজের পায়ের তলার মাটি।

বাংলা উপন্যাসের জগতে শুধু নয়, বাংলা নাট্যসাহিত্যের দুনিয়াতে এ উপন্যাস এক অসামান্য দলিল

হয়ে রইল। যেমন ছবির মতো ফুটে উঠেছে সেই সময়ের সমাজচিত্র, তেমনি নিপুণভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে মনস্তত্ত্ব, আলোচিত হয়েছে যুযুধান নাট্যগোষ্ঠীগুলির দ্বন্দ্ব, আর সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে শিশিরকুমার ভাদুড়ি নামক কিংবদন্তির অভ্যুত্থান। যে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় অপরূপ মহিমায় বর্ণনা করা হয়েছে তাতে প্রায় একটি চলচ্চিত্র দেখার অভিজ্ঞতা হয়, যে ছবির নাম হতেই পারে ''দ্যূতক্রীড়ক''।

অনুরাধা কুন্ডা : ফিনিক্স, দি এক্সপেরিমেণ্টাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্দেশক, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং কবি, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। মালদা কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক।